সুখের নাটাই

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

অবতরণিকা	৯
ছোট ছোট ত্যাগে স্বপ্নিল জীবন	১০
জোছনার শিশিরে	২৬
অন্তরালের ছায়া	৪৩
সুখের খোঁজে	৫৫
অভিমানী মনের আত্মদহন	৭২
করি পুষ্পরে বিকশিত	৮৪

ছোট ছোট ত্যাগে স্বপ্নিল জীবন

এক.

রান্নাঘরের দরজায় এসে শাশুড়িকে ভেতরে দেখে থমকে দাঁড়াল আরিশা। ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না, এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। বিয়ের দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো সে ঠিক মানিয়ে নিতে পারেনি শ্বশুরবাড়ির সবার সাথে। বাবা-মা আর দুই ভাইবোনকে নিয়ে আরিশাদের ছোট পরিবার। কিন্তু বিয়ের পর এসে পড়েছে বিশাল বড় যৌথ পরিবারে। যদিও শ্বশুরবাড়ির সবাইকে খুব ভালোই মনে হয়েছে, কিন্তু সবাই যেন কেমন নিজের মতো থাকতে পছন্দ করে। তাই কী করবে, কী করণীয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না সে। বড় জা অন্তরাকে রান্নাঘরের দিকে আসতে দেখে সালাম দিল আরিশা।

সালামের জবাব দিয়ে অন্তরা হেসে বলল, 'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ যে?'

'নাস্তা বানাচ্ছেন, সাহায্য করতে যাব ভাবছিলাম।'

'সেটা আর হচ্ছে না। সকালের নাস্তা মা নিজ হাতে বানাতেই পছন্দ করেন। এই বাড়ির ছেলেরা দিনের শুরুটা মায়ের হাতের রান্না খেয়ে করতে চায় তো, সে-জন্য। তারচে' চলো বাগানে যাই। একটু হাওয়া খেয়ে আসি।'

বাধ্য মেয়ের মতো অন্তরার সাথে বাগানে চলে এলো আরিশা। অন্তরার স্বামী, মানে এই বাড়ির বড় ছেলে আবিরের বাগান এটা।

‘এই বাগানের সব ফুল বেগুনি কেন? ভাইয়ার কি বেগুনি রং খুব পছন্দ?’ আরিশার কণ্ঠে বিস্ময়।

‘উহুঁ, বেগুনি রং আমার খুব পছন্দের। বাগানের আদর-যত্ন উনিই করেন সাধারণত। উনি শহরের বাইরে গিয়েছেন তাই আমি করছি। তোমার কথা বলো, কেমন লাগছে বাড়ির সবাইকে?’

‘জি, ভালো।’

‘কিন্তু তোমাকে খুব আপসেট দেখাচ্ছে। অবশ্য প্রথম প্রথম সবারই এমন হয়। পুরোপুরি নতুন একটা পরিবেশ, নতুন লোকজন, নতুন সম্পর্কের ভিড়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারাটাই স্বাভাবিক।’

‘আপনারও হয়েছিল এমন?’

অন্তরা হাসে। নিজের বধূ হয়ে আসার গল্প শোনায়। শাশুড়ির সহযোগিতায় এত বড় পরিবারে মানিয়ে নিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সংসারের মূলমন্ত্রগুলো তার কাছ থেকেই শেখা। একজন শাশুড়ি যদি তার দীর্ঘ জীবনের সাংসারিক অভিজ্ঞতাগুলো পুত্রবধূর হাতে তুলে দেন, তাহলে সেই পুত্রবধূর জন্য এরচেয়ে বড় পাওয়া আর কিছুই হতে পারে না । অন্তরার মতে, শাশুড়ি-বউয়ের সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কমিউনিকেশন গ্যাপ। একে অন্যের সাথে কথা ঠিকই বলে, কিন্তু একে অন্যকে বোঝানোর বা বোঝার চেষ্টা করে না। সুস্তির ব্যাপার হলো এ বাড়ির কর্ত্রী তেমন নন। তিনি নিজের সব কথা যেমন বুঝিয়ে বলেন, ঠিক তেমনি ছেলের বউদের কথাও মন দিয়ে শোনেন এবং বোঝার চেষ্টা করেন।

আরিশাও এই অল্প কদিনে এমনটাই দেখেছে নিজের শাশুড়িকে। বিয়ের আগে যেদিন তিনি আরিশাকে দেখতে গিয়েছিলেন, সেদিন খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন, ‘বিয়ে কোনো রূপকথার গল্প নয়। এখানে চিরকাল সুখে-শান্তিতে বসবাসের নিশ্চয়তা নেই।’

অন্তরাকে এ কথা জানাতেই সে বলল, ‘আমরা খুব ভালো শাশুড়ি পেয়েছি, জানো? উনি নিজে পুত্রবধূ হিসেবে কষ্ট করেছেন অনেক। তাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে কষ্ট নিজে করছেন, সে কষ্ট তার ছেলের বউদের সহ্য করতে দেবেন না। যা-ই হোক, এসব কথা তুমি বরং আম্মার কাছ থেকেই শুনে নিয়ো। এখন চলো নাস্তা করবে।’

ইচ্ছে করেই আরিশাকে সবটা বলে না অন্তরা। সে যেমন শাশুড়ির কাছ থেকে সংসার-জীবনের অভিজ্ঞতাকে উপহার হিসেবে পেয়েছে, আরিশাও শাশুড়ির কাছে সেই উপহার বুঝে নিক। শাশুড়ির অভিজ্ঞতাকে উপহার হিসেবে না পেলে অন্তরাও হয়তো জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে বুঝত যে, ছোট ছোট ত্যাগ জীবনকে সুপ্পিল করে তোলে। শুধু জানা না থাকার কারণে ত্যাগগুলো করা সম্ভব হয় না।

দুই.

ছোট ছেলের বউকে চুপচাপ বাগানে বসে থাকতে দেখে বুকের ভেতর কষ্টের যে নদীটা সময়ের শীতল প্রবাহে বরফে ঢেকে গিয়েছিল, তা আবার গলতে শুরু করল আফসানা রহমানের। নিজের বিয়ের পরের সময়গুলোর স্মৃতি ভেসে উঠল মনের পর্দায়। বিশাল বড় পরিবারের বড় বউ হিসেবে যখন শ্বশুরবাড়িতে পা রেখেছিলেন, মনে কত হাজারো স্বপ্নই না ছিল তার। কিন্তু মাস ঘুরতে না ঘুরতেই সেই স্বপ্নের স্থান দখল করে নিয়েছিল অনিশ্চয়তা। মনে হতো যেন মাঝ দরিয়ায় আটকা পড়েছেন। চারিদিকে কোথাও কোনো কূল-কিনারা চোখে পড়ত না। কোনো কাজ না পারলে শিখিয়ে দেবার কেউ ছিল না। কিন্তু বউ কিছুই জানে না, কিছুই পারে না, বাবা-মা কিছুই শেখায়নি—এসব বলার মানুষের কোনো অভাব ছিল না। ভালো-মন্দ পরামর্শ দেবার কেউ না থাকলেও দোষ খুঁজে বের করার মতো অনেকেই ছিল। শত কাজ করেও কিছুতেই শাশুড়ির মন রক্ষা করা যেত না।

বুক চিরে লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আফসানা রহমানের। তবে এটা ঠিক যে, সময় ভালো হোক বা খারাপ, একভাবে না একভাবে কেটেই যায়; কিন্তু স্মৃতি সবসময় রয়ে যায় মনের গহিনে। তাই সময় যেমনই হোক, মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা থাকা উচিত স্মৃতি যেন যাতনাকর না হয়। কেননা অতীতের সেই সব স্মৃতি বর্তমানের সুন্দর সময়গুলোকেও ম্লান করে দেবার ক্ষমতা রাখে।

ধীর পায়ে পুত্রবধূর কাছে রওনা হলেন আফসানা রহমান। শাশুড়িকে দেখে আরিশা উঠে দাঁড়াতে চাইল। আফসানা রহমান তাকে ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো মা। আমি তোমার সাথে গল্প করতেই এসেছি। বিয়ের পর নানা ধরনের ব্যস্ততা, তারপর তোমাদের ঘুরতে যাওয়া—সবকিছু মিলিয়ে তোমার সাথে তেমন করে কথা বলাই হয়ে ওঠেনি। জানাও হয়নি তোমার কেমন লাগছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না।'

শাশুড়ির কণ্ঠের মায়া আরিশার অন্তরকে ছুঁয়ে দিল যেন। মৃদু গলায় বলল, 'আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না, মা। আর এই বাড়ির সবকিছুই ভীষণ ভালো লাগছে!'

পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আফসানা রহমান। বললেন, 'তুমি যে সময়টার ভেতর দিয়ে যাচ্ছ, আমিও একসময় এমন সময় পার করেছি। তাই জানি কেমন লাগে, কেমন লাগছে তোমার। নিজের বাবা-মা-ভাই-বোন, চিরচেনা গণ্ডি ছেড়ে নতুন পরিবেশে নতুন মানুষদের মাঝে এসে একটা মেয়ের কেমন অসহায় লাগে, সেটা শুধু আরেকটা মেয়েই বোঝে।'

'আপনারও বিয়ের পর এমন লেগেছিল, মা?' অবাক হয় আরিশা।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আফসানা রহমান মুচকি হাসলেন। তাদের সময়টাই অন্যরকম ছিল। পুত্রবধূর সাথে একজন শাশুড়ি সেই আচরণই করত, যেমন আচরণ সে পেয়ে এসেছে তার শাশুড়ির কাছ থেকে। জীবনের শুরুতে শাশুড়ির প্রতি অনেক অভিমান ছিল তার। কিন্তু একটা সময়ে বুঝেছেন, যে কণ্টকাকীর্ণ পথে তিনি চলছেন, তার পদযুগলও ক্ষত-বিক্ষত তেমন পথে চলে। তাই তো নিজের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, নিজের পুত্রবধূদের এমন পথে চলতে দেবেন না কখনোই। কিন্তু এই বুঝ আসতে অনেক সময় লেগেছে। তার আগে কীভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন সে কথা ছেলের বউদের সাথে শেয়ার করা খুব প্রয়োজন।

'আমার খুব কষ্ট হয়েছিল মানিয়ে নিতে। অনেক চেষ্টার পরও শ্বশুরবাড়ির কারও আচরণের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখিনি। তখন বুঝে নিলাম, যদি কিছু বদলায়, তবে শুধু আমার পক্ষ থেকেই বদলাবে, অপরপক্ষ থেকে না। তোমাদের শ্বশুর আমাকে বলেছিলেন, ''মানুষের সবসময় আশা ধরে রাখা উচিত। এটা ঠিক যে, আশা সবাই করে কিন্তু খুব কম মানুষই সেই আশার প্রতিফলে ভালো কিছু পায়। এমন তো হতে পারে যে, তুমি সেই খুব কমসংখ্যক মানুষদের একজন।''

তিনি সবসময় আমাকে আশা ধরে রাখার প্রেরণা জুগিয়েছেন। বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হয়েছিল?'

'ধীরে ধীরে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছিল। আসলে কী জানো, একটা মেয়ে চাইলেই সংসারকে গড়তে পারে। সংসার গড়ার অপরিসীম ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ

সৃষ্টি করেছেন প্রতিটি মেয়েকে। সমস্যা হচ্ছে নিজের এই ক্ষমতা সম্পর্কে বেশিরভাগ মেয়েই জানে না। আর যারা জানে, তাদের অনেকেই ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না বেশিদিন। বেড়ে ওঠার পরিবেশ থেকে যেহেতু আমরা নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করতে শিখি না, তাই ধৈর্য রাখাটা বেশ কঠিনও বটে।'

'কিন্তু ধৈর্যটাই বা ধরে রাখব কী করে?' অনভিজ্ঞ আরিশা বুঝতে পারে না কী করে এমন পরিবেশেও ইতিবাচক থাকা সম্ভব।

আরিশার প্রশ্নে হাসলেন আফসানা রহমান। বললেন, 'আমি যে দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনার মুখোমুখি হয়েছি, কাউকে আমি এর জন্য দায়ী মনে করিনি কখনোই। সবকিছুকে আমার নিয়তি মনে করে নিয়েছি। তাই হয়তো আমার সাথে যা কিছু হয়েছে সবই আমাকে আরও মজবুত হতে সাহায্য করেছে। আমাকে কম্প্রোমাইজ ও সবর করতে শিখিয়েছে। এরপরও কখনোই যে ভেঙে পড়িনি তা না। পালাতেও চেয়েছি বহুবার। কিন্তু তোমাদের শ্বশুরের জন্য পারিনি।'

'তার মানে বাবা সবসময় আপনার সাথে ছিলেন। সে-জন্যই আসলে আপনি কঠিন পথ পার করে আসতে পেরেছেন!'

'আলহামদু লিল্লাহ! সত্যিই উনি পাশে না থাকলে আমি হাল ছেড়ে দিতাম। তবে সবচেয়ে বড় কথা কী, জানো? যেদিন থেকে আমি শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের বাবা-মা, দেবর-ননদদের ভাইবোন ভাবতে পেরেছিলাম মন থেকে; সবকিছু অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল আমার জন্য। থাক এসব কথা এখন। তোমার কথা বলো।'

'আজ বিকেলের নাস্তা আমি বানাই, মা?' সুযোগ বুঝে নিজের ইচ্ছেটা জানিয়ে দেয় আরিশা।

'রান্না করতে খুব পছন্দ করো বুঝি?'

'জি মা, ভীষণ।'

'ঠিক আছে, চলো নাস্তা বানানোর ফাঁকে ফাঁকে তোমার কথা শুনব।'

তিন.

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অভিমানে মনের আকাশ মেঘলা হয়ে উঠল আরিশার। বিকেলে ফেরার কথা মঈনের, অথচ এখন রাত নয়টা বাজে। গত সপ্তাহেও দুই দিন এমন দেরি করে বাসায় ফিরেছে মঈন। ফিরতে দেরি হবে সেটা ফোন করেও তো জানাতে পারে, তাহলে তো আর এভাবে অস্থির হয়ে প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে হতো না তাকে। এসে স্যরি স্যরি করবে, একশোটা কারণ দেখাবে কিন্তু একটা ফোন করতে কতটুকু সময়ই বা লাগে? কিছুক্ষণ বইপত্র নাড়াচাড়া করে দেখল আরিশা। মন বসাতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

শ্বশুর-শাশুড়ি বাগানে বসে গল্প করছে। অজান্তেই এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল আরিশার মুখে। গত চার মাসে সে এটা খুব ভালোমতো বুঝে গিয়েছে যে, শ্বশুর-শাশুড়ির মহাভাব। একে অন্যকে ছাড়া কিছুই বোঝে না তারা। পর মুহূর্তেই মঈনের কথা মনে পড়ল তার। অভিমানের মেঘ আরও ঘনীভূত হলো মনের গভীরে।

'মঈন বুঝি এখনো ফেরেনি?' প্রশ্ন শুনে ঘুরে বড় জাকে দেখে আরিশা বলল, 'জি না, ভাবি।'

অন্তরা হেসে বলল, 'তাহলে আমার সাথে চলো। রান্না করতে করতে গল্প করব।'

'রাতের রান্না তো হয়ে গেছে, ভাবি।'

'হুমম...জানি। কিন্তু তোমার ভাইয়া মাত্র ফোন করে বললেন কয়েকজন মেহমান আসবে তার সাথে।'

রান্নাঘরে ঢুকে আরিশা বলল, 'ভাইয়া বুঝি প্রায়ই এমন করেন?'

'কী? হঠাৎ মেহমান নিয়ে আসা? ঠিকই ভেবেছ।' হাসল অন্তরা।

'আমার আব্বুরও এই অভ্যাসটা ছিল। হঠাৎ করে মেহমান নিয়ে হাজির হতেন। আম্মুকে তখন অনেক বিপদে পড়তে হতো। হয়তো সারাদিন পর একটু বিশ্রাম নেবার জন্য ঘরে ঢুকেছেন আর আব্বুর ফোন, 'মেহমান নিয়ে আসছি।' ঘরে কী রান্না হয়েছে, বাজার আছে কি না—এসব নিয়ে কোনো কথা নেই। এক কথা, 'মেহমান নিয়ে আসছি।' এগুলো খুব অন্যায় মনে হয় আমার কাছে।'

অন্তরা আবারও হাসল। এগুলো যে অন্যায় সেটা ছেলেরা বোঝেই না। অন্তরার ধারণা সংসারের এসব টুকিটাকি বিষয়ে ছেলেরা মেয়েদের মতো করে ভাবে না। বিয়ের প্রথম প্রথম সে-ও বেশ বিরক্ত হতো। পরে দেখল যে, এটা আবিরের স্বভাব। মেহমানদারি করতে পছন্দ করে। আর এটা যেহেতু খারাপ কিছু না বরং ভালো; তাই নিজেকে এর সাথে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে অন্তরা। ধীরে ধীরে মানিয়েও নিয়েছে।

আরিশাকে সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করল সে, 'আসলে সংসার জায়গাটাই বোঝাপড়ার। দুজনেরই বুঝতে হবে দুজনকে। হঠাৎ মেহমান নিয়ে আসার কাজটি নিশ্চয়ই আমাকে কষ্ট দেবার জন্য করে না আবির? আবার এমনও না যে, রোজ রোজ করে এটা। হয়তো কোনো ফ্রেন্ড বা পরিচিত কারও সাথে দেখা হয়ে গেল। কখনো আবির অফার করে, কখনো তারা নিজেরাই আসতে চান বাসায়। এখন এটাকে ইস্যু করলে অশান্তি তো আমাদের দুজনের জীবনেই আসবে।'

'কিন্তু বিষয়টা তো একেবারে ইগনোর করার মতোও না।'

'আই থিংক ইস্যু করার মতোও না। সংসারে সচরাচর যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলোর সাথে মানিয়ে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি যেমন মেহমানের জন্য মোটামুটি একটা প্রিপারেশন নিয়েই রাখি সবসময়। আলাদা করে কিছু খাবার রেডি করে রাখি হঠাৎ আসা মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য। তাই তেমন কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় না কখনোই। এটা না করে যদি আমি রোজ রোজ খিটপিট করতাম আবিরের সাথে, তাহলে আমার জীবনের শান্তিই তো বিঘ্নিত হতো, তাই না?'

'সবসময় কি এত পজিটিভ থাকা সম্ভব, ভাবি? কষ্ট হয় না আপনার?'

আরিশার সরল প্রশ্নে হেসে ফেলে অন্তরা।

'কষ্ট হয়, কিন্তু আমার কাছে সেই কষ্টের চেয়ে সংসারের শান্তি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে-জন্য স্বামীর দোষ ধরে সময় নষ্ট করার চাইতে, দোষটা আসলেই দোষ কি না এবং আমার কতটুকু ছাড় আর আবিরের কতটুকু সংশোধন দরকার, সময়টাকে সেই কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করি। একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, দোষ খুঁজে আমরা যে সময়টা ব্যয় করি, সে সময়টা যদি একে অন্যেকে বোঝার ও সংশোধন করার জন্য ব্যয় করতে পারতাম, তাহলে সংসারটা অনেক সহজ হয়ে যেত আমাদের জন্য। বিয়ের দিন আমার বাবা কী বলেছিলেন, জানো?'

অন্তরাকে কথার নেশায় পেয়েছে। মেহমানদের জন্য চুলায় রান্না চাপিয়ে ছোট জাকে বলতে থাকে নিজের জীবনের কথা।

'বাবা বলেছিলেন, সবসময় মনে রাখবে, স্কুল-কলেজের পরীক্ষার মতো সংসারটাও একটা পরীক্ষা তোমার জন্য। কারও সাহায্য ছাড়াই কেবল আল্লাহর দেয়া মেধা-প্রতিভা ও নিজের পরিশ্রমের জোরে জীবনের প্রতিটা পরীক্ষায় যেভাবে তুমি প্রথম হয়েছ, তেমনি সংসার নামক পরীক্ষাতেও প্রথম হবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জারি রাখতে হবে তোমাকে। আর যারা জীবনের প্রতিটা পরীক্ষায় টপ করতে চায়, অন্যেরা কী করছে না-করছে সেসব দেখার সময় তাদের থাকে না। জীবনের ছোট ছোট পরীক্ষায় সফল হতে হতে তারা ছুটে চলে আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতার পানে।'

চার.

বাড়ির গেটে এসে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে শঙ্কাবোধ করল মঈন। ফেরার কথা ছিল তার বিকেলে, এখন বাজে রাত দশটা। ঘরে ঢুকেই আরিশার গোমড়া মুখ দেখতে হবে। গতদিনের মতো আবার না কান্না জুড়ে দেয়, সেই ভয় কাজ করতে লাগল মনে। ইচ্ছে করে বা শখ করে দেরি করেনি, এই কথাটা কেন যে বুঝতে চেষ্টা করে না! মন খারাপ করা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মঈনের। ফোন করে জানাতে পারত আরিশাকে যে, ফিরতে দেরি হবে। কিন্তু তাতে বাইরে থাকা অবস্থাতেই মনোমালিন্য শুরু হয়ে যেত। তার মন খারাপ হতো, সেই প্রভাব গিয়ে পড়ত কাজের ওপর। এমনটা চায়নি বলেই ফোন করার রিস্ক নেয়নি সে। সমস্যা হচ্ছে এ কথা তো আর আরিশাকে বলা যাবে না। এমন সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘরে পৌঁছে গেল সে। ঘরে ঢুকে যা দেখল, মঈন তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

তার পছন্দের লাল শাড়ি পরেছে আরিশা, সেজেছে মনের মতো করে। দেখে মনে হচ্ছিল চাঁদের এক টুকরো নেমে এসেছে ধরিত্রীর বুকে। কিন্তু আরিশার হাসিমুখের সালাম শুনে ভাবুকতা মুহূর্তে উবে গিয়ে সেখানে স্থান করে নিল সংশয়। ঝড়ের আগের শান্ত প্রকৃতি নয় তো এটা? মৃদু কণ্ঠে সালামের জবাব দিল সে।

আরিশা হেসে বলল, 'তুমি এভাবে তাকিয়ে কী দেখছ আমার দিকে? যাও, ফ্রেশ হয়ে এসো। জানো, আমি তোমার জন্য মাছ রান্না করেছি। তাড়াতাড়ি চলো, খেয়ে বলবে রান্না কেমন হয়েছে।'

ধীরে ধীরে আরিশার কাছে গিয়ে মঈন বলল, 'দেরি হবার জন্য আমি সত্যি খুব স্যরি। তুমি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করেছ, কষ্ট পেয়েছ? আসলে হঠাৎ করে কয়েকজন ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

আরিশা বলল, 'এরপর থেকে এমন হলে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবে। আমি রাগ করব না বরং তোমার সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করব।'

'তুমি রাগ করবে ভেবে আমি ফোন করি না সেটা কীভাবে বুঝলে?'

'সেটা তো বলব না। তবে আজ ভাবি আমাকে এমন কিছু কথা বলেছেন, যা আমার চিন্তা-ভাবনায় অনেক পরিবর্তন এনেছে।'

'তাই নাকি! কী বলেছেন ভাবি?'

'ভাবি সবসময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করেন। এত কথা এখন বলতে পারব না। যাও তো, ফ্রেশ হয়ে নাও। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।'

হাসিমুখে ওয়াশরুমের দিকে এগিয়ে গেল মঈন।

পাঁচ.

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে পরিপাটি করে নেবার ফাঁকে আয়নায় মাঝে মাঝে আবিরের দিকে তাকাচ্ছিল অন্তরা। মুখের সামনে বই ধরা, কিন্তু চেহারা থমথম করছে। আবির আজ ভালোই রেগেছে তার ওপর। ভাবতেই দুষ্টুমির আবেশ ছেয়ে গেল অন্তরার মনে। অবশ্য কিছুটা অপরাধবোধও কাজ করতে লাগল। দেড় ঘণ্টা আগে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল আবির। কিন্তু সব কাজ শেষ করে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল অনেক। আবিরের মন ভালো হয়ে যাবে এমন কিছু শব্দ গোছানোর চেষ্টা করতে শুরু করল মনে মনে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে অন্তরা বলল, 'আজ রাগের ওপর দারুণ একটা লেখা পড়েছি, জানো?'

বই বন্ধ করে আবির বলল, 'তোমার হলে দয়া করে লাইট বন্ধ করো। ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমাব এখন।'

'আরে শোনোই না!' অন্তরা হাসি চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, 'রাগ দমন করা ছাড়া নাকি আত্মিক সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই তো রাগের

ধ্বংসাত্মক দিক নিয়ে বড় বড় মনীষীরা...'

'চুপ করো তো, অন্তরা। ঘুমোতে দাও আমাকে।'

অন্তরা নাছোড়বান্দা। আবিরের রাগ না ভাঙিয়ে ঘুমাতে দেবে না কিছুতেই। এবার তাই নিজের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল সে। কাব্য করে বলল, 'জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু মুহূর্ত আসতেই পারে। তাই বলে কি অভিমানে জ্বালাব দিয়া? নক্ষত্রভরা রাত ঢেকে দেবো মেঘের চাদরে? নিরানন্দে ডোবাব জীবনের স্বাদ? ভালোবাসাকে করব না ধারণ? ক্ষমাকে করি চলো আপন, আবার সাজাই সুখের স্বপন...'

না চাইতেও মুগ্ধতা জড়ানো হাসি ফুটে উঠল আবিরের মুখে। অন্তরার ওপর রাগ করে থাকা ভীষণ কঠিন।

ছয়.

শ্বশুরবাড়ির সবাই দুষ্টুমি করে অন্তরাকে ডাকে বহুরূপী গিরগিটি নামে। অবশ্য নামটা যথার্থই। কারণ, বহুরূপী গিরগিটি যেমন যখন যে গাছে বাস করে সে গাছের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের রং বদলায়, অন্তরা সবার রঙে নিজেকে রাঙিয়ে পরিবারের মধ্যমণিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি সদস্যের সুখে-দুখে, আনন্দ-বেদনায় পাশে থাকতে চেষ্টা করে সে। সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, আর তাই সে ভালোবাসা দ্বিগুণরূপে ফিরে আসে সবসময় তার কাছে। কষ্ট-ব্যথা যে পায় না পরিবারের কাছ থেকে তা অবশ্য না। কিন্তু সেগুলোকে মনে ধরে বসে থাকে না কখনোই। অন্তরার যুক্তি হচ্ছে, একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরে থেকে মানুষ কেন জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করবে? এমন বোকামো কখনোই কারও করা উচিত নয়। কারণ, জীবন হচ্ছে গতির নাম। শারীরিক ও মানসিক গতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এমন সবকিছুকে তাই যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতে হবে।

রান্নাঘরে ঢুকে মেজো জা যাবিনকে মুখ ভার করে কাজ করতে দেখে অন্তরা দুষ্টুমির ছলে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ কি ঝিঁঝিঁ পোকার আনন্দমুখর গান? ভুলে যাও না তবে অকারণ এই মান-অভিমান। তাকিয়ে যদি দেখো জোনাকির আলো বিচ্ছুরণ, মুহূর্তে মনের বিষাদ তোমার হয়ে যাবে হরণ।'

'উফ্, ভাবি! তুমি আর তোমার কাব্য! এগুলো কি সঙ্গে সঙ্গে বানাও? নাকি আগেই লিখে রেখেছ? অবশ্য সুখী মানুষেরা সব পরিস্থিতিতেই ছন্দ মিলিয়ে ফেলতে পারে।'

অন্তরা চোখ বড় বড় করে বলল, 'সে কী! তুমি দুখী মানুষ? এই তথ্য তো জানা ছিল না আমার। তা হঠাৎ তোমার দুখী মানুষ হবার রহস্য কী?'

'তোমার সামনেই তো তোমার দেবর আমাকে কত কথা শোনাল!'

'তুমি তো জানোই, ব্যবসার কারণে সাকিব অনেক দুশ্চিন্তা-অস্থিরতার মধ্যে আছে।'

ক্ষোভ ঝরে পড়ল যাবিনের কণ্ঠে, 'ভাবি, দুশ্চিন্তার সময় মানুষ যে আচরণ করে, সেটাই কিন্তু বলে দেয় তার মনে কার অবস্থান কোথায়!'

'সংসারের টুকটাক মনোমালিন্যকে এই সংজ্ঞা দিয়ে বিবেচনা করলে কিন্তু জটিলতা বেড়ে যাবে জীবনের। সব সংজ্ঞা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।'

'হুম... তুমি তো এমন বলবেই, কারণ ভাইয়া তো কখনোই তোমার সাথে মিসবিহেইভ করেন না।'

'করেন না কথাটা ঠিক না, যাবিন। আসলে আমি সবসময় চেষ্টা করি এমন সবকিছু এড়িয়ে চলতে যেটাতে তোমার ভাইয়া বিরক্ত হতে পারেন। নয়তো তোমার ভাইয়াও কখনো মনোরম উদ্যান, শোভিত জনপদ, অঝোর জলপ্রপাত, আবার কখনো ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি।'

অন্তরার দুষ্টু দুষ্টু কথা শুনে মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যায় যাবিনের। কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করে, 'ভাবি, ভাইয়া কি সত্যিই রাগ করে তোমার সাথে? মনে কষ্ট দিয়ে কথা বলে?'

অন্তরা স্বভাবসুলভ হাসি দিয়ে বলল, 'আসলে কী জানো, যাবিন? আমরা কষ্ট পাই না বরং কষ্ট তৈরি করি। আমাদের কেউ কষ্ট দেয় না, আমরাই কষ্ট টেনে নিই নিজের ওপর।'

'সেটা কীভাবে?'

'বিষয়টা অনেকটা এরকম—কোনো ঘটনা বা কথা তোমাকে কতটা বিচলিত করবে, সেটা নির্ভর করে তুমি ঘটনা বা কথাকে কীভাবে দেখছ বা গ্রহণ করছ তার ওপর। অর্থাৎ, তোমার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন—মানুষ কষ্ট পায় না, কষ্ট তৈরি করে। আর কে কেমন কষ্ট তৈরি করবে সেটা তার বেড়ে ওঠার

পরিবেশ, শিক্ষা আর বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। তুমি এই কথাগুলো নিজের সাথে মিলিয়ে দেখো, তাহলেই বুঝতে পারবে।'

'কিন্তু সাকিব আমার সাথে মিসবিহেইভ করেছে বলেই আমি কষ্ট পেয়েছি। অকারণে কষ্ট তৈরি করিনি।'

'এই যে যুক্তিটা দিলে এটা কিন্তু কষ্ট তৈরিতে আরও সহায়তা করছে।'

'এত না পেঁচিয়ে তুমি বরং আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

'এই যেমন দেখো, সাকিব তোমার স্বভাব আর অভ্যাস নিয়ে কিছু কথা বলেছে। মিথ্যা বা ভুল কিছু কিন্তু বলেনি। তুমি যা করো সেসবই বলেছে। তুমি যদি মেনে নিতে, তাহলে মান-অভিমানের প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু তুমি মেনে না নিয়ে উলটো রাগ করেছ। তোমাকে বোঝে না, সম্মান করে না, যথেষ্ট ভালোবাসে না ইত্যাদি ইত্যাদি নানা কথা ভাবছ। অথচ সাকিব কিন্তু এসবের কিছুই বলেনি, এই প্রতিটি চিন্তা তোমার নিজের তৈরি করা। তোমার কল্পনাপ্রসূত এসব চিন্তাই তোমার মনে নতুন নতুন কষ্ট তৈরি করছে।'

যাবিন মেয়েটা একটু অবুঝ কিন্তু বোঝানোর চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। অন্তরা সে চেষ্টাই করে সবসময়।

'জানো, যাবিন? মানুষ কোনো একটি ঘটনা বা কথাকে কেন্দ্র করে নেতিবাচক চিন্তা করতে করতে পাহাড় সমান কষ্ট তৈরি করে ফেলে। আর যে সকল চিন্তা তৈরি করে, তার বেশিরভাগ চিন্তাই বাস্তব নয়। এমন অর্থহীন বা অবাস্তব চিন্তা করে সে নিজেকে কষ্ট দিয়ে জীবনকে নষ্ট করে, ধ্বংস করে। অথচ নিজের ভুল মেনে নেবার মাঝে কিংবা হঠাৎ করে ফেলা অন্যের কোনো ভুল আচরণ ক্ষমা করে দেবার মাঝে হেরে যাবার কিছু নেই।'

'কিন্তু নিজেকে যে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বিশেষ করে কেউ যখন আমার অপছন্দনীয় কিছু করে তখন।'

'তোমাকে সবসময় যে কথাটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে, জগতে তোমার ইচ্ছেমতো কেউই চলবে না। কারণ, তোমার নিয়ন্ত্রণে কেউ নেই। তোমার নিয়ন্ত্রণে আছ কেবল তুমি নিজে। আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই দেখবে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।'

সাত.

‘এই জন্যই তো আমি বলি, কোনোদিন বিয়ে করব না!’

ছবি আঁকা বন্ধ করে বাক্যটির উৎস সন্ধানে চোখ তুলে তাকাল অন্তরা। দরজায় ননদ দাঁড়িয়ে আছে।

‘তোমার আবার কী হলো?’

ভাবির পাশে এসে শারলিন বলল, ‘বিয়ে মানেই হচ্ছে জীবনের সব স্বপ্ন সাধের অবসান ঘটিয়ে অন্যের রঙে রাঙিয়ে যাওয়া।’

‘একে অন্যের রঙে মিশে যাওয়া তো খারাপ কিছু না।’

‘একে অন্যের রঙে মিশে যাওয়া খারাপ কিছু না ঠিক, কিন্তু এমনটা তো ঘটে না। ছেলেরা নিজেদের বদলায় না, বউকে বাধ্য করে বদলাতে। এই যে তুমি এত চমৎকার ছবি আঁকো, একসময় স্বপ্ন দেখতে আর্টিস্ট হওয়ার। বিয়ের পর কি সেই স্বপ্ন তোমাকে ছেড়ে দিতে হয়নি? তোমার কি মনে হয় না ভাবি, তুমি তোমার প্রতিভাকে তার আপন গতিতে চলতে দাওনি? আমি হলে কখনোই এমন করতাম না। কারও জন্যই নিজের স্বপ্নকে ত্যাগ করতাম না। তুমিই বলো অন্যের জন্য নিজের স্বপ্ন বলি দেয়াটা কি ভুল কিছু নয়?’

এত জটিল চিন্তায় যেতে চায় না অন্তরা। হয়তো ভুল, হয়তো ঠিক। তবে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু ভুল হয়ে যায়। ভুলটাকে ধরে বসে না থেকে যদি সামনে এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে তা জীবনের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

‘শারলিন, আমি বিষয়টা এভাবে দেখি না। একটা স্বপ্ন পূরণ করতে হলে মানুষকে আরেকটা স্বপ্ন ছাড়তে হয়।’

‘এটা তো নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়া কথা।’ ঠোঁট উলটায় শারলিন।

‘আমার ধারণা এটা নিজেই নিজের কষ্টের কারণ হওয়া থেকে বাঁচার উপায়। আমার একটু ত্যাগ যদি আমার জীবনকে সুখী-সুন্দর করতে পারে, তাহলে কেন আমি সেটা করতে কার্পণ্য করব বলো! তাছাড়া আমি কিন্তু আমার স্বপ্ন হারিয়ে যেতে দিইনি। সময়

পেলে আমি ছবি আঁকি, টুকটাক ডিজাইন করি নিজেদের জন্য। আসলে আমরা চাইলেই একই সাথে নিজের এবং আপনজনদের স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারি। কিন্তু আমরা সে চেষ্টা না করে মিথ্যে অহংবোধের কারণে শুধু শুধু জীবনটাকে জটিল করে তুলি।'

এবার শারলিন মেয়েদের সেই চিরায়ত প্রশ্ন ছুড়ে দেয় ভাবির দিকে, 'মেয়েরাই কেন ছাড় দেবে সবসময়?'

'সে কী! এখানে আবার ছেলে-মেয়ে আসছে কেন? সংসারের সুখের জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলেই চেষ্টা করতে হবে। ছাড় দেয়াটা যখন যার জন্য সহজ হবে তখন সে দেবে। সংসার তো কোনো প্রতিযোগিতা নয়, যে সারাক্ষণ হার-জিতের চিন্তা করতে হবে।'

'সবাই তো এভাবে চিন্তা করে না। একবার মেয়েরা ছাড় দিলে ছেলেরা সুযোগ পেয়ে যায়।'

শারলিনের এমন কথায় হেসে ফেলে অন্তরা। রং-তুলি রেখে পূর্ণ মনোযোগ দেয় আদরের ননদিনির দিকে।

'সবার চিন্তা করে আমি আমার জীবনকে কেন জটিল করব? অন্যের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার জীবন চালাতে চাই না। সমস্যা কিন্তু ছাড় দেয়া বা না দেয়া নিয়ে নয়। সমস্যাটা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই জানে না, সে কেন ছাড় দিচ্ছে। যদি জানত তাহলে ছাড় দেয়াটা কখনোই ইস্যু তৈরি করত না সংসারে। কিন্তু আমি জানি, আমি কেন ছাড় দিচ্ছি। আমি ছাড় দিয়েছি আমার নিজের সুখের জন্য। আমি আমার ছোট্ট একটা স্বপ্নকে ত্যাগ করেছি সারা জীবনকে স্বপ্নিল করার আশা নিয়ে।'

'কিন্তু সবসময় তো এমন হয় না, ভাবি। নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করেও অন্যকে প্রভাবিত করা যায় না; বরং এই ত্যাগের সুযোগই গ্রহণ করে সবাই।'

'সেক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে পরীক্ষা। যখন মানুষ তার ভালো কাজের মূল্য পায় না, উলটো তাকে আরও অবহেলিত হতে হয়, আমি মনে করি সেটাই তার জন্য পরীক্ষা। এবং এরচেয়েও বড় কথা হচ্ছে আমাদের সকল কাজের প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছে আশা করতে হবে।'

'তারপরও ভাবি, শুনতে যত সহজ শোনায়, এত সহজ না বিষয়গুলো।'

‘আচ্ছা, প্রশ্ন কঠিন এই ভয়ে কি আমরা পরীক্ষা দেয়া ছেড়ে দিই? উহুঁ, বরং পরীক্ষায় পাশের জন্য খুব ভালোমতো প্রস্তুতি নেই। সম্পর্কের মাঝের সমস্যাগুলো যদি আমরা পরীক্ষা মনে করে, পাশের লক্ষ্যে নিজেদের প্রস্তুত করার চেষ্টা করতাম তাহলে খুব ভালো রেজাল্ট না করলেও ফেল অন্তত করতাম না। টেনেটুনে পাশ হয়তো করেই যেতাম। বেতবন আর জলপাই গাছের গল্পটা জানো, শারলিন?’

‘কোনটা বলো তো?’

‘বেতবন আর জলপাই গাছের মধ্যে নিজেদের শক্তি নিয়ে তর্ক চলছিল। জলপাই গাছ বলল, তুমি তো একটু বাতাসেই নুইয়ে পড়ো। তোমার আবার শক্তি কোথায়? বেতবন এ কথার কোনো উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর ঝড় এলো। প্রচণ্ড ঝড়। বেতবন ঝড়ের ঝাপটা কোনোভাবেই বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না। বাতাসের ধাক্কায় সে একবার এদিকে নুয়ে পড়ে আরেকবার ওদিকে। ঝড় শেষে দেখা গেল ঝড়ের ধাক্কা সামলে উঠেছে সে, দাঁড়িয়ে আছে নিজের পায়ে। ওদিকে বিরাট শক্তিশালী জলপাই গাছ বাতাসের ধাক্কাকে ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ল। এখন বলো কী শিখলে এই গল্প থেকে?’

‘উমম... আমাদের উচিত অবস্থা অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করা। ঠিক বলেছি?’

‘একদম! আমি সবার সাথে এই কাজটি করারই আপ্রাণ চেষ্টা করি। আমরা নিজেদের ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, কষ্ট ইত্যাদিকে বড় করে দেখি বলেই আমাদের জীবনটা জটিল হয়ে ওঠে। এভাবেই সম্পর্কের মাঝে দূরত্ব আসে, ব্যবধান বাড়ে, কাছের মানুষরা দূরে চলে যায়। শুধু একটু ইচ্ছা, প্রচেষ্টা, অন্যেকে বুঝতে পারার মানসিকতাই সম্পর্কগুলোকে করে দিতে পারে সুপ্পিল।’

‘আর যখন ভালো করেও খারাপ আচরণ পেতে হয়, তখন?’

‘তখন হাদিসের বাণী আমাকে ধৈর্য ধরে কাজ করে যেতে প্রেরণা জোগায়—সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়, যে সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা জোড়া দেয়।’[১]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫৯৯১

‘ইশ, কী কঠিন কাজ!’

‘কঠিন তো বটেই! আমাদের সমস্যা কী, জানো? এক হাতে দিয়ে, অন্য হাতে প্রতিদান নেবার জন্য তৈরি হয়ে যাই আমরা। যখন হাত শূন্য থেকে যায়, সহ্য করতে পারি না। মনের ভেতর কুপ্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ভুলেই যাই আমাদের সব কাজের বহুগুণ প্রতিদান ফিরিয়ে দেবার জন্য একজন বসে আছেন। কিন্তু আমাদের ধৈর্য যে বড় কম, যেকোনো ত্যাগের তৎক্ষণাৎ মূল্যায়ন চাই আমাদের।’

‘তুমি কারও কাছ থেকে কিছু পেতে চাও না, তাই না ভাবি?’

অন্তরা চিরাচরিত হাসি দিয়ে বলে, ‘হ্যাঁ, চাই না কোনো প্রতিদান। কারণ, আমি যা করি নিজের জন্য করি, অন্যের জন্য না। আজ যদি আমি তোমার জন্য ছোট কোনো একটা ত্যাগ করি, তার বদলে আমাদের ননদ-ভাবির সম্পর্ক আরও সুন্দর হবে। সুতরাং, পরোক্ষভাবে আমিও লাভবান হব। আবার যদি তোমার কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি নাও পাই, আত্মীয়তার হক রক্ষার পুরস্কার আমি পাবই, ইনশা আল্লাহ।’

‘ও আচ্ছা! এই তাহলে তোমার গিরগিটি হবার রহস্য?’

বলেই হাসতে থাকে শারলিন। তার হাসিতে যোগ দেয় অন্তরাও। ননদ-ভাবির খুনশুটিতে একটা বিকেল পার হয়ে যায়। ক্যানভাসে আঁকা আধাআধি ছবিটা পড়ে থাকে এক কোণে। রং-তুলির আঁচড়ে সুখ খোঁজার চাইতে অন্তরার কাছে মানুষে মানুষে সম্পর্কটা বড় বেশি দামি। এতে যদি হাজারটা ক্যানভাস ‘অসমাপ্ত ছবি’ হয়ে পড়ে থাকে, থাক না!